গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪০ সংখ্যা | ২৭ মে - ২ জুন ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

উৎপাদন খরচেই জ্বালানি বিক্রি করতে হবে

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

গত কয়েক বছরে যেভাবে পেট্রল-ডিজেলের দাম হু হু করে বেড়েছে, সেই তুলনায় সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জ্বালানি তেলের উপর যে সামান্য কর কমিয়েছে আদতে তা সরকারের মুখরক্ষার বাহানা ছাড়া কিছুই নয়। ভারত সরকারের উচিত জ্বালানির উপর থেকে সমস্ত কর ও সেস তুলে নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যে ভাবে ঘন ঘন বাড়ছে তার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা।

জনসাধারণ যাতে উৎপাদন খরচেই পেট্রল-ডিজেল সহ সমস্ত জ্বালানি পেতে পারে তা সরকারকে নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি। এরই সাথে সমস্ত স্তরের জনগণের কাছে তিনি ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত ভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান, যাতে সরকারকে এই সঙ্গত দাবি মানতে বাধ্য করা যায়।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, শাস্তির দাবিতে

বিক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে, বিকাশভবনে

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বিরাট কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বর্তমান শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী, পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী সিবিআই দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিজে তাঁর কন্যার বেআইনি নিয়োগের দায়ে অভিযুক্ত। ছশোর বেশি নিয়োগ ইতিমধ্যে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসংগঠন এআইডিএসও, যুবসংগঠন এআইডিওয়াইও ২০ মে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায়। এসইউসিআই (সি) ২৪ মে বিকাশভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং স্মারকলিপি দিয়ে দোষীদের শাস্তির দাবি জানায়। উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশের বাধা মোকাবিলা করে বিক্ষোভ চলে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে ৫০ জন ছাত্র-যুব কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশি আক্রমণে ১০ জন আহত হন।

এর আগে ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা টেট নিয়ে কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এলেও তার সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। কোনও নেতা মন্ত্রী বা আমলার বিরুদ্ধে কোনও রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরপর ২০১৪ সালে প্রাথমিক স্কুলে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বের হয়। এই পরীক্ষাতেও দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তৎকালীন এক বিধায়ক প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ২০১৪তে তিনি তাঁর স্ত্রী, বৌদি সমেত ৬২ জনকে প্রাইমারি স্কুলের চাকরি নিয়ম ভেঙে পাইয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল মন্ত্রী, বিধায়ক জেলাসভাপতির নাম করে বলেছিলেন, যারা অনেককে পিছনের দরজা দিয়ে প্রাইমারি শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই তা মোটা টাকা লেনদেনের বিনিময়ে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

এসএসসি-তে বেআইনি নিয়োগের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে এআইডিএসও-এআইডিওয়াইও-র বিক্ষোভ। ২০ মে

জ্ঞানবাপী মসজিদ ঃ অভিযোগটাই বেআইনি

বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার পর যখন সর্বোচ্চ আদালত সেই জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিল এবং সংখ্যালঘু সমাজ তা মেনে নিতে বাধ্য হল, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, এই নিয়ে বিজেপি-আরএসএসের বহু দিনের দাপাদাপি এর মধ্যে দিয়ে শেষ হল। এখন দেশের মানুষ নিশ্চিন্তে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু না, তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন। যদি রামের প্রতি নিখাদ ভক্তিই তাঁদের এই দাবির পিছনে কাজ করত তবে হয়ত তারা ওইখানেই ক্ষান্ত দিত। কিন্তু রামের প্রতি ভক্তি বা ধর্মের প্রতি আবেগ তো এই বিতর্কে তাদের প্ররোচিত করেনি, তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই দাবির মধ্যে দিয়ে হিন্দু আবেগ উসকে তুলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক সংহত করা এবং ক্ষমতার গদিতে গিয়ে বসা। সেদিন সেই লক্ষ্য পূরণ হলেও ক্ষমতায় বসে তা যে রাজ কায়েম করেছে তাতে মানুষের জীবনের সমস্যাগুলিই আরও তীব্র হয়েছে মাত্র। ফলে তাদের শাসনে মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে হলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তাদের বিশেষ প্রয়োজন। তাই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের পর বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ। তারপর মথুরার শাহি ইদগা মসজিদ। বাহানার যেন শেষ নেই। এ সবই নাকি এক কালে মন্দির ভেঙে তৈরি হয়েছিল। তাই এখন সেই সব মসজিদ ভেঙে ফেলে মন্দির তৈরি করতে হবে।

বিজেপি-আরএসএসের এই সব দাবির পিছনে বাবরি মসজিদ মামলার রায়ই যে কাজ করছে এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এই রায়ে উৎসাহিত হয়েই উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা একের পর এক দাবি তুলে চলেছে। আর এর পিছনে থেকে শাসক বিজেপিই যে এই সব দাবিকে মদত দিয়ে চলেছে তা-ও আজ আর কারও অজানা নয়। আজ এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নীতির ফলেই ওষুধ সহ প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আজ আকাশ ছুঁয়েছে। বেকারত্ব গত অর্ধশতকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছেছে। নোট বাতিল, জিএসটি চালু এবং অপরিকল্পিত লকডাউন সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে। করোনা মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা মৃত্যুর বিপুল সংখ্যা গোপন করেও ঢাকা যায়নি। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। নানা কৌশলে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা জিতলেও এই ক্ষোভ বুঝতে বিজেপি নেতাদের অসুবিধা হয়নি।

এই অবস্থায় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবি থেকে বাঁচতে শাসক বিজেপির হাতে একমাত্র পুঁজি মানুষের ধর্মীয় আবেগকে খুঁচিয়ে তোলা। সেই কাজেই আটঘাট বেঁধে নেমে পড়েছে বিজেপি-আরএসএস। একটি কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে দিয়ে আদালতে দাবি তোলানো হয়েছে, বারণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদটি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের একাংশ ধ্বংস করে তৈরি হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পক্ষ থেকে এমন দাবি তুলে সামাজিক সুস্থিতিকে গুলিয়ে দেওয়ার, সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ নামিয়ে এনে তাদের কোণঠাসা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দাবিতে ১৯৯১ সালে উপাসনাস্থল রক্ষা আইন পাশ হয়েছিল। সেই আইন অনুযায়ী, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টে মন্দির মসজিদ গির্জার মতো উপাসনাস্থলের ধর্মীয় চরিত্র যেখানে যেমন ছিল তাই থাকবে। তার কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। আইনে বলা আছে, মন্দির-মসজিদের চরিত্র নিয়ে কোনও পুরনো মামলা টিকবে না। নতুন কোনও মামলাও করা যাবে না। একমাত্র বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্ক ছাড়া সবক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তা হলে জ্ঞানবাপী মসজিদ সম্পর্কে যে দাবি বিজেপি-আরএসএস তুলেছে তা কি বেআইনি নয়? বারাণসী আদালতই বা সেই বেআইনি অভিযোগ গ্রহণ করে কী করে? সুপ্রিম কোর্টই বা জানা-মাত্র এমন অভিযোগকে নস্যাৎ করল না কেন? কেন এমন একটি সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক মামলাকে জেলা আদালতে পাঠানো হল? ২০১৯-এ অযোধ্যার মামলার রায়ে শীর্ষ আদালতই বলেছিল, ধর্মীয় উপাসনাস্থল রক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। সব ধর্মের সমানাধিকারের প্রতি ভারতের দায়বদ্ধতার

আটের পাতায় দেখুন

বিক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে

একের পাতার পর

কিছুদিন আগে রাজ্য সরকার এসএসসি পরীক্ষায় রিজিওনাল লেভেল সিলেকশন টেস্ট-এর বদলে স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টব্যবস্থা আনে। এসএলএসটি-র নিয়োগের প্যানেলও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। শুধুমাত্র শিক্ষক নিয়োগেই নয় গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি নিয়োগেও দুর্নীতি সামনে এসেছে। এসএসসির গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, এসএলএসটি সহ দুর্নীতির মোট সাতটি মামলায় প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্নীতি যাচাইয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দেন। গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি পদে যথাক্রমে ৫৭৩ এবং ৩৫০ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও বেতন বন্ধের নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিয়ে প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির উপর তদন্তভার তুলে দেয়।

বাগ কমিটির রিপোর্টে দুর্নীতির এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। রিপোর্টে জানা গেছে গ্রুপ ডিতে ৬০৯ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই ধরনের নিয়োগে সম্পূর্ণ প্যানেল বা মেধাতালিকা প্রকাশ করত না এসএসসি। রিপোর্ট বলছে এই তালিকা ভুয়ো, পছন্দমত নাম ঢুকিয়ে তৈরি করা। এসএসসি-র সুপারিশ করা তালিকা অনুসারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিয়োগপত্র দেয়। কমিটির রিপোর্ট বলছে, এই বছর থেকে এসএসসি-র তালিকায় আধিকারিকদের নিজের হাতের স্বাক্ষরের বদলে চালু হয় ডিজিটাল স্বাক্ষর। এর পিছনেও পর্ষদের কিছু কর্তার মদত ছিল। নিয়ম অনুযায়ী এসএসসি পাঁচটি আঞ্চলিক অফিস থেকে সফল পরীক্ষার্থীদের নাম সুপারিশ করা হয়। তারপর তাতে সিলমোহর দেয় প্রধান অফিস। অভিযোগ এই নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রাপকরা বঞ্চিত হয়েছেন। অভিযোগ আঞ্চলিক অফিস থেকে সঠিক নাম এলেও মূল অফিসে এসে তা বদলে গিয়েছে। সুপারিশপত্রে আঞ্চলিক অফিসের চেয়ারম্যানদের সই জাল করে এই কাজ করা হয়েছে। প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর নিয়ম ভেঙে ৩৮১ জনকে চাকরির সুপারিশ পত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় পাস না করা ২২২ জনকে এসএসসি অফিস থেকে সুপারিশপত্র দেওয়া হয়েছিল। বাগ কমিটি এই নিয়োগ দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড হিসাবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে গঠিত ৫ জনের 'নজরদারি' কমিটিকে চিহ্নিত করেছে। এই কমিটির বুদ্ধিতে তৈরি হয়েছিল অবৈধ নিয়োগের কৌশল। জাল হয়েছে সুপারিশপত্রের সই, পোড়ানো হয়েছে ওএমআর শিট, ডিলিট করা হয়েছে কম্পিউটারের সমস্ত ডেটা। বাদ যায়নি স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সহ আধিকারিকদের নামও। এমনকি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির নামও এই তালিকায় আছে। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সুপারিশপত্রগুলি এসএসসি 'উপদেষ্টা' শান্তি প্রসাদ সিনহা নিজে পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন। এই নিয়োগপত্রগুলি পর্ষদের অফিস থেকে না দিয়ে এসএসসি-র নবনির্মিত ভবন থেকে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিচারপতি বাগ কমিটি। এমনকি লেনদেনের হিসাব নিকাশ করার জন্য ছিল আলাদা রেজিস্টার। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল স্কুল সার্ভিস কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা। তার উপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য অন্য কোনও ধরনের নজরদারি কমিটি গঠন চূড়ান্ত বেআইনি।

বাগ কমিটির রিপোর্টে ছত্রে ছত্রে এই বেআইনি বিষয় বেরিয়ে আসার পরও মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে কার্যত সেই সমস্ত দুর্নীতিবাজদের আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেবার মাস তিনেকের মধ্যেই বর্তমান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী ইন্টারভিউতে না বসেই এসএলএসটি-র মেধাতালিকার ওয়েটিং লিস্টের এক নম্বরে স্থান পেয়ে যান।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি আমাদের দেশে বা রাজ্যে এটাই প্রথম নয়। রাজ্যে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার, তারপর সিপিএম সরকারের আমলে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত একটা সময় ছিল যখন ম্যানেজিং কমিটির হাত ধরে নেতা ও মন্ত্রীদের বাড়ির লোকেরা, আত্মীয়-স্বজনরা ও শাসক দলের কর্মীরাই স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পেয়ে যেত। এর জন্য বহু ক্ষেত্রে দিতে হত মোটা টাকার ডোনেশন। ফলে বঞ্চিত হত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। শুধু এই রাজ্য নয় ত্রিপুরাতেও কংগ্রেস আমলে দুর্নীতি হয়েছে। পরে সিপিএমের আমলে ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিযুক্ত ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে সে রাজ্যের হাইকোর্ট স্বচ্ছতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৯৭-এর এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) তৈরি করার পিছনে সিপিএম সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই নিয়োগকে কেন্দ্রীয় ভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা। স্কুলের নিয়োগে দুর্নীতি লাগামছাড়া হওয়ায় স্বচ্ছতার একটা প্রলেপ দেওয়াও তাদের তখন দরকার ছিল। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে কমিশনই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে এসেছে।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর একেবারে শিক্ষকতা এবং অন্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগে খোলাখুলি দুর্নীতি শুরু করে। সাংবিধানিক সংস্থা পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে (পিএসসি) পর্যন্ত পঙ্গু করে দেওয়া হয়। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ অফিসার নিয়োগের ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাতেও পিএসসি-র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ভুরিভুরি।

এই দুর্নীতির উৎস কোথায়? ভারতে ক্ষমতাসীন এমন কোনও দল নেই, যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে কংগ্রেস, বিজেপি বা অন্য কোনও দল, যেই থাক বারবার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়েছে। কংগ্রেসের বোফর্স কেলেঙ্কারি, চিনি কেলেঙ্কারি বা কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি, শেয়ার কেলেঙ্কারি, মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের ব্যাপম কেলেঙ্কারির কথা সবাই জানে। সম্প্রতি কর্নাটকে এক কনট্রাক্টর বিজেপির এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কাটমানি চাওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছিলেন এবং 'না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা' স্লোগানের প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জানিয়েও কোনও প্রতিকার না পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এমন উদাহরণ অসংখ্য। কিন্তু এর থেকে বেরোবার পথ কী? দুর্নীতি রোধ কি কোনওভাবেই সম্ভব নয়?

এ কথা ঠিক, যেমন চাহিদা, সেই অনুপাতে চাকরির সুযোগ থাকলে এই দুর্নীতির চিন্তা, ঘুষ দেওয়া বা নেওয়ার চিন্তা জন্ম নেওয়ার জমি আদৌ পেত না। আজ সরকারের সংস্কার নীতির ফলে চাকরির পোস্ট বিলুপ্ত হচ্ছে। গত ছয় বছরে রেলে ৫৬ হাজারের বেশি পদ ছাঁটাই করা হচ্ছে। এমনি অবস্থা সর্বত্র। শিল্পায়নও থমকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্যই। চাকরির ভীষণ সংঘর্ষ। এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজেই চরম অনৈতিকতার উপর, অন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাকে যারা রক্ষণাবেক্ষণ করছে, দুর্নীতির বাইরে তারা থাকবে কীভাবে? আজ দুর্নীতি দূর করার সংগ্রাম তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নির্মূল করার সংগ্রামের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার আমডাঙা লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির কর্মী কমরেড মৃত্যুঞ্জয় জানা ৪ এপ্রিল আকস্মিকভাবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। মৃত্যুসংবাদ শুনে দলের কর্মীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

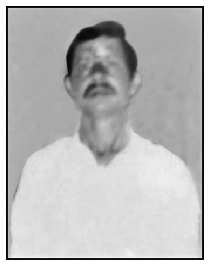

২০০৩ সাল নাগাদ কৃষি-বিদ্যুৎ এর ভয়াবহ মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনে এবং পরবর্তীকালে এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার আমডাঙা ব্লকের বোদাই হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষা বাঁচাও কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন হয়। পরে এলাকার মানুষের সমর্থনে কমরেড মৃত্যুঞ্জয় জানা এই স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

২০০২-০৩ সালে যখন চারদিকে সিপিএম এর বিরোধী-শূন্য করার জন্য হুমকির দাপটে কেউ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করত না, সেই সময় তিনি সিপিএম সমর্থক হয়েও তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। একেবারেই সাধারণ কৃষক ঘরের স্বল্পশিক্ষিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত রাজনৈতিক খবরাখবর রাখার জন্য খুঁটিয়ে সংবাদপত্র পড়তেন। পরবর্তীকালে গণদাবী পত্রিকা ও কমরেড শিবদাস ঘোষের লেখা বইগুলি পড়ে তিনি তাঁর পুরনো দলের মেকি বামপন্থা সম্পর্কে সজাগ হতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি এসইউসিআই(সি)-র স্থানীয় কর্মীদের অভিভাবক হয়ে ওঠেন। এলাকায় তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় বড়দা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মানুষের সুবিধা-অসুবিধায় তিনি এগিয়ে যেতেন। ২৮-৩০ সদস্যের বৃহৎ পরিবারে তিনি সকলকে একসাথে নিয়ে চলে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পরিবারের বাইরেও তার উদার হস্ত সর্বদা প্রসারিত ছিল। তাঁর স্বপ্ন ছিল পার্টি কবে আরও অনেক বড় হবে। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন উন্নত চরিত্রের কমরেডকে হারাল।

৬ মে তাঁর স্মরণসভায় দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অনুকূল ভদ্র বক্তব্য রাখেন।

কমরেড মৃত্যুঞ্জয় জানা লাল সেলাম

উত্তরবঙ্গে ব্যাঙ্ককর্মী সম্মেলন

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট কর্মী ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৫ মে শিলিগুড়ি স্টেডিয়াম হলে। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অভিজিৎ রায়। কমরেডস গোপাল দেবনাথ ও বিজয় লোধ যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন।

লেনিনের নামাঙ্কিত রাস্তার নাম পরিবর্তনের চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ

দুর্গাপুরে মহান লেনিনের নামাঙ্কিত রাস্তার নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি) সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের যৌথ উদ্যোগে ১৮ মে বিক্ষোভ সংগঠিত হয় দুর্গাপুর কর্পোরেশন চত্বরে। বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ সভা থেকে এক প্রতিনিধি দল মেয়র এর কাছে স্মারকলিপি দেয়। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি জানানো হয়। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হওয়া অবধি আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এই দাবিতে দুর্গাপুরের নাগরিকদের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে বলে জানানো হয়।

কৃষক ও খেতমজুরদের একমাত্র সংগ্রামী সংগঠন

এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্মেলন সফল করুন

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তিনটি কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয় দেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে বিপুল প্রেরণার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে কৃষক খেত মজুর আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি ঘটেছে বহুগুণ। সকল কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইনসঙ্গত করা, খরা-বন্যা রোধ, কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা, সার বীজ কীটনাশকের দাম কৃষকের নাগালের মধ্যে রাখা ইত্যাদি দাবিতে কৃষক খেত মজুররা আজ সর্বত্র সোচ্চার। এই প্রেক্ষিতেই এ আই কে কে এম এস-এর অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১-৩ জুন নদীয়া জেলার দেবগ্রামে।

অতীতে এ রাজ্যে তে-ভাগা আন্দোলন, খাস-বেনাম জমি উদ্ধার ও বন্টন আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদি বহু বড় বড় গণআন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। জয়ও অর্জিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে। কিন্তু স্বাধীনতার বয়ঃবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে জনজীবনের সংকটও বেড়েছে দ্রুত গতিতে। কৃষক জীবনের মৌলিক দু'টি সমস্যা, ১) ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, ২) চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যথা সার-বীজ-কীটনাশক, বিদ্যুৎ, ডিজেল ইত্যাদির লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি।

আমাদের দেশে কৃষি বা কৃষক মজুর জীবনে সীমাহীন সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে কে বা কারা? কী কারণে কৃষি উপকরণের দাম এত আকাশছোঁয়া? চাষির ফসলের লাভজনক দাম পাওয়ায় বাধা কোথায়, এ সবের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কার হাতে? কৃষক আন্দোলনের সামনে এগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নে আমাদের দেশে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে।

স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি দেশের শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে। এরপর কংগ্রেস বিজেপি (পূর্বের জনসংঘ) ইত্যাদি তাবৎ বৃহৎ শক্তিশালী দক্ষিণপন্থী দলগুলি পর্যায়ক্রমে ভোটে জিতে পার্লামেন্টে মন্ত্রীত্বে আসে এবং কৃষিক্ষেত্রে নানা নীতি গ্রহণের মাধ্যমে এই পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এদের পুঁজি বৃদ্ধিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে। প্রত্যক্ষভাবে এরা তাদের সহযোগী শক্তি, অন্য কথায় সেবকও। এদের চেনা সহজ। কিন্তু কমিউনিস্ট নাম নিয়ে সিপিআই, সিপিআই(এম), সিপিআই (এম, এল) এবং তাদের কৃষক সংগঠনগুলি এই প্রশ্নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বেশি। তাদের বিপ্লবের তত্ত্বে তারা সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্ততন্ত্রকে শত্রু চিহ্নিত করে জাতীয় বুর্জোয়াদের মিত্র চিহ্নিত করেছে। তাই শিল্প কিংবা কৃষিতে যেখানে জাতীয় বুর্জোয়ারাই শোষণের হোতা, সেখানে তাদের বিরুদ্ধে তারা যথার্থ কোনও লড়াই গড়ে তুলতে পারেনি। গ্রামে বড় বা মাঝারি জোতের মালিকরা, যারা কংগ্রেস ছিল, তারাই সিপিএম সরকারের আমলে হয়ে ওঠে তাদের মিত্র শক্তি। কৃষি প্রধান এই রাজ্যে কোটি কোটি গ্রামীণ সর্বহারা, গরিব, নিম্ন-মধ্য চাষি, খেত-মজুরদের সমর্থন তারা পেলেও তাদের সংগঠিত করে, বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে যে শ্রেণি সংগ্রামের সূচনা হতে পারত, তা করা হয়নি। কলকারখানার মতো গ্রামেও মজুরি বৃদ্ধি, আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সভাসমিতি কিংবা ধর্মঘট হয়েছে, কিন্তু মূল শত্রু কে, মিত্র কারা এসব প্রশ্ন নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। বিপরীতে এ আই কে কে এম এসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জোতদার বিরোধী কৃষক আন্দোলনগুলি ধ্বংস করতে সমাজ বিরোধী ও পুলিশ দিয়ে ব্যাপক আক্রমণ করেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সহ কয়েকটি জেলায় পুলিশের গুলি চালনায় এবং এদের আশ্রিত সমাজবিরোধীদের আক্রমণে কৃষক খেতমজুর আন্দোলনের নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন দেড় শতাধিক। এই মেকি কমিউনিস্টদের শ্রেণি-মিত্র জাতীয় বুর্জোয়ারা আজ

রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সেজে উঠেছে নদিয়ার দেবগ্রাম

শোষণের জাঁতাকলে শ্রমিক-কৃষকদের পেষণ-শোষণ করে বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া মালিকে পরিণত হয়েছে। তারাই লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। তাদের শাসনে ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রকাশ পেয়েছে। সারা দেশব্যাপী গড়ে উঠেছে শোষণ-পীড়নের এক পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। তার ফলে আজ দেশের মোট সম্পদের ৭৪ শতাংশের মালিক ১ শতাংশ পুঁজিপতি শ্রেণি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এ আই কে কে এম এস-এর প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ক্ষমতাসীন এই পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণমূলক চরিত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করেন।

তিনি দেখান শিল্পক্ষেত্রের মতো কৃষিক্ষেত্রেও পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শোষণের ফলে জমি স্বল্প সংখ্যক গ্রামীণ মালিকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া, জমি হারিয়ে অধিকাংশ গরিব চাষির খেতমজুর তথা গ্রামীণ সর্বহারায় পরিণত হওয়া, কৃষি উৎপাদন জাতীয় বাজারের পণ্যে পরিণত হওয়া এবং কৃষি উৎপাদনে মালিক-মজুর সম্পর্ক ইত্যাদি পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলির সম্যক ব্যাখ্যা করেন তিনি। ফলে এ দেশে শিল্প-কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই যে পুঁজির শোষণের জাল বিস্তৃত এবং দেশের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালিত হবে সামগ্রিক ভাবে তারই বিরুদ্ধে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক, মজুর, সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নানা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দাবি আদায় করা, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণ করা নিয়ে যে সব লড়াই আপনারা প্রতিদিন করে চলেছেন, সেগুলিকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াই হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এই সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যখন আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন, একমাত্র তখনই আপনারা বর্তমান অবস্থাকে পাল্টাতে পারবেন। ...যার সাহায্যে শেষপর্যন্ত এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে পারবেন। (শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৯)

পুঁজির সেবায় নিয়োজিত কংগ্রেস ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বায়ন ও তথাকথিত আর্থিক সংস্কারের পথ গ্রহণ করে। তারই উপযোগী করে কৃষিক্ষেত্রকে গড়ে তোলার প্রয়োজনে তৃতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন করে। বিজেপি, সিপিআই(এম), সহ বাম-ডান বিভিন্ন দল তা ব্যাপক ভাবে সমর্থন করে। বিস্ময়ের কথা, সেই 'জাতীয় কৃষিনীতিতে' কৃষকদের সমস্যা সমাধানে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি হল ১) কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, ২) জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন সংশোধন ও বৃহৎ জোত সৃষ্টি করে চুক্তি চাষ, লিজ প্রথায় চাষকে আইনসিদ্ধ করা, ৩) সরকারের হাতে ন্যস্ত পতিত জমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া, ৪) সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণের উপর সরকারি ভর্তুকি বন্ধ করা, ৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানির উপর থেকে বিধিনিষেধ বিলোপ ইত্যাদি। এর দ্বারা তারা দেশের সমগ্র কৃষিক্ষেত্রকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শোষণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করার পরিকল্পনা পাকা করেছে। ২০২০ তে বিজেপি যে কৃষিনীতি নিয়ে আসে, তাতে এর অনেকগুলি বিষয়ই ছিল। এই সর্বনাশা নীতির প্রয়োগ দেখা যায় রাজ্যে রাজ্যে।

এ রাজ্যে পূর্বতন সিপিএম পরিচালিত সরকার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে যথাক্রমে টাটা এবং ইন্দোনেশিয়ার সালেম গোষ্ঠীর হাতে হাজার হাজার একর কৃষি জমি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরা জমি ঊর্ধ্বসীমা আইন তুলে দিতে চায়। এমনকি ভূমি সংস্কার আইনে সংশোধনী এনে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে বর্গাদার উচ্ছেদও আইনসঙ্গত করতে চায়। তার পরিণতি হয় ভয়াবহ। রাজ্যে মোট কৃষিজমির পরিমাণ ৫৬.৮০ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে ৯২.২৩ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জোত। এসব জোত অলাভজনক। পুঁজিবাদী শোষণে এসব জোতের মালিকরাই জমি হারায় বেশি। জমি হারায় পাট্টাদার, বর্গাদারও। ১৯৭৭ সালে সিপিএম শাসনের সূচনাপর্বে রাজ্যে খেত মজুরের সংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ। আর ২০০৯ সালে তাদের শাসনের শেষপর্বে তা বেড়ে হয় ১ কোটির বেশি। বর্তমানে তৃণমূল শাসনে সে সংখ্যা আরও অনেক বেশি। পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসনেই জমি হারিয়ে তারা খেত মজুরে পরিণত হয়েছে।

কংগ্রেস ২০১০ সালে সারে বিনিয়ন্ত্রণ নীতি এনে সার উৎপাদন ও দাম নির্ধারণের সমূহ দায়িত্ব তুলে দেয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের হাতে। সারে ভর্তুকি যা ছিল তাও দেওয়া হয় তাদেরই। তার উপর চলে ব্যাপক কালোবাজারি। সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী ব্যাপক মারমুখী আন্দোলন সংগঠিত হয় এ আই কে কে এম এসের উদ্যোগে। আন্দোলন বহুলাংশেই জয়যুক্ত হয়।

আবার শুরু হয় সরকারের বীজনীতির অত্যাচার। তা হয় চাষিদের উচ্চফলনের লোভ দেখিয়ে। তারা বীজের দাম প্রভূত বাড়ায়। অপর দিকে উচ্চফলনশীল এই সংকর বীজে জল, সার কীটনাশকের প্রয়োজন বেশি। সে সবের দামও বিপুল। সেখানেও নিয়ন্ত্রণ সেই একচেটে পুঁজির। সেখানেও ব্যবসা চলে রমরমিয়ে। গরিব চাষি ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধা তেমন পায় না। তারা নির্ভর করে মহাজনের কাছে নেওয়া অতি চড়া হারে সুদে নেওয়া ঋণের উপর। ফসলের দাম না পেয়ে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে যায়। সহায় সম্বলহীন ঋণগ্রস্ত চাষি আত্মহত্যাকেই বাঁচার পথ হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হয়। বিগত দশ বছরে সরকারি মদত পুষ্ট একচেটিয়া পুঁজির ফাঁদে পড়ে চাষির আত্মহত্যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে চার লক্ষের উপর। এমনি এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠী বহু অর্থব্যয়ে তাদের ত্রাতা হিসাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'উন্নয়ন বান্ধব' আখ্যা দিয়ে ক্ষমতায় আনে। তারা তিন কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল ২০২১ এনে কৃষিক্ষেত্রকে দেশি বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির শোষণের স্বার্থে পরিণত করার সামগ্রিক পরিকল্পনায় আইনি তকমা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। যার বিরুদ্ধে এক বছর ধরে প্রবল কৃষক বিক্ষোভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত সরকার নীতি পাল্টাতে বাধ্য হয়।

এ রাজ্যে এখন তৃণমূল শাসনে ধান, পাটের অভাবি বিক্রি করতে চাষি বাধ্য হচ্ছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য চালু করায় সরকারের কার্যকরী কোনও উদ্যোগ নেই। যা আছে তা দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য। একটি ব্লকে একটি মাত্র কিসান মাণ্ডি, নেতাদের ধরে ধান বিক্রির টোকেন সংগ্রহ, বিক্রির লাইন পাওয়া, কুইন্টালে ৫-৮ কেজি ধান বাটা দেওয়া ইত্যাদি নানা হয়রানিতে তিতিবিরক্ত চাষি ৪০০-৫০০ টাকা কম দামে খোলা বাজারে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। পাট বিক্রির জন্য জে সি আই থাকলেও রাজ্যে তা বহু দিন বন্ধ। পাট চাষিরা কখনও একটু বেশি দাম পেলেও প্রায় প্রতিবছর তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প বা এনরেগা প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল রাখার জন্য কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু তাও সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতি ও দলবাজিতে ভরা। এই প্রকল্পে জবকার্ড হোল্ডাররা এখন কাজ করেন খুব কম। কাজ হয় জেসিবি যন্ত্রে। জবকার্ড হোল্ডারদের নামের তালিকা ধরে মাস্টার রোল পূরণ করা হয়। জবকার্ড হোল্ডারদের সামান্য কিছু টাকা দিয়ে বাকিটা চলে যায় পঞ্চায়েত, দলীয় নেতা, আর একদল দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মচারীদের পকেটে। রাসায়নিক সারের দাম বৃদ্ধির কোনও সীমা-পরিসীমা নেই—বাড়াচ্ছে পুঁজিপতিরা সরকারের মদতেই। তার উপর সার এবং কীটনাশক উভয় ক্ষেত্রেই আছে ব্যাপক কালোবাজারি। বন্যা-নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণে সরকার টাকার বরাদ্দ করে, কিন্তু তার বণ্টন ব্যবস্থা দুর্নীতি মুক্ত নয়। তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধগুলির মেরামতি এবং রাজ্যে সামগ্রিকভাবে খরা-বন্যায় স্থায়ী সমাধানে তাদের ভূমিকা খুবই দুর্বল। ভোটব্যাঙ্ক ঠিক রাখাই

সাতের পাতায় দেখুন

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন রায় : ২৫০ জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) ছিলেন সে সময়ের এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। যাঁর যুক্তিশাণিত লেখা পড়ে ভারতের চিন্তাশীল মানুষ তো বটেই এমনকি ইউরোপের বিদগ্ধজনেরা বিস্মিত হচ্ছেন। শেলি, কোলরিজের মতো কবিরা তাঁর চিন্তার সংস্পর্শে আসছেন। সমাজ প্রগতির ধারা নিয়ে রবার্ট আওনের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হচ্ছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কথা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের শ্রমজীবী মানুষের যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করছেন। কী ভাবে ভারত অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হচ্ছে, তথ্য প্রমাণ সহ তুলে ধরছেন তাও। ফ্রান্সের জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিষ্ঠাকে উচ্ছ্বসিত স্বাগত জানাচ্ছেন। এই বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন লুই ফিলিপ তাঁকে দেখার জন্য ডিনারে আমন্ত্রণ করছেন, সংবর্ধনা দিচ্ছেন। কেউ তাঁর নামে সন্তানের নামকরণ করছেন। তাঁর সাথে একটি বার দেখা করার জন্য সারা রাত অপেক্ষা করছেন কেউ কেউ। কিন্তু প্রতিভার ব্যাপ্তি আন্তর্জাতিক হলেও তাঁর পা ছিল সব সময় ভারতের মাটিতেই, কর্মক্ষেত্র ছিল সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ কন্টেন্ট ছিল দেশীয় কিন্তু ফর্মটা ছিল তখনকার অর্থে আন্তর্জাতিক। এজন্যই ১৮৩২ সালে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'The Struggles are not merely between reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world, between justice and injustice and between right and wrong' এই মন নিয়েই রামমোহন রায় ভারতের সমাজকে অন্ধকারমুক্ত করতে প্রাণ হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন। ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের মহান এবং ঐতিহাসিক সূচনা করেন।

ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধতা করায় পরিবার প্রতিবেশীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন রামমোহন রায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নানা প্রদেশে ঘুরেছেন, অর্জন করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দেখেছেন সর্বত্রই মানুষে মানুষে নির্মম ভেদাভেদ, সাধারণ মানুষের উপর ধর্মের নামে নৃশংস অত্যাচার। পদে পদে মনুষ্যত্বের অবমাননা তাঁকে কাঁদিয়েছে। তবে বেদনা বিমর্ষ করতে পারেনি তাঁকে। বরং কার্যকরী জ্ঞানচর্চা থেকে অনিবার্য রূপে প্রস্ফুটিত হয় যে সক্রিয় সামাজিক দায়িত্ববোধ তা তাঁকে বলীয়ান করেছে অফুরান মাত্রায়।

যেসব ধর্মগ্রন্থের দোহাই দিয়ে ধর্মগুরুরা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উপর চলা শাসন শোষণের সমর্থন করে সে সমস্ত সহ তৎকালীন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের বইপত্র রামমোহন পড়েছিলেন। পড়ে আত্মস্থ করার জন্য আরবি, ফার্সি, উর্দু, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন মাতৃভাষার মতোই। প্রয়োজনের নিরিখে আরবিতে লিখেছেন 'নানা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা' (মানাজারাতুল আদিয়ান)।

তার পর ১৮০৪ সালে ফার্সিতে লিখলেন, 'একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার' (তুহফৎ-উল-মুওয়াহিদ্দিন)। এই বইটির ছত্রে ছত্রে যা আছে সেগুলো বলে দেয় কেন রামমোহন ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ, 'ভারতপথিক', ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বা আধুনিক ভারতের জনক। প্রায় দুশো কুড়ি বছর আগে এ দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে রামমোহন এই বইতে লিখেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়ে উঠে তারই অনুকরণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিধানগুলিকেই চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস করে। ...কার্য ও কারণের ক্রমপরম্পরায় অনুসন্ধানে অভ্যস্ত না থাকাতে তারা কোনও বিশেষ নদীতে স্নান করা কিংবা কোনও গাছ বা পাথর পূজা জপ-তপ এবং পুরুতদের কাছ থেকে অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত মার্জনাদি কাঞ্চনমূল্যে কিনে নেওয়াকে (বিভিন্ন ধর্মের বিশেষত্ব অনুসারে) সারা জীবনের পাপক্ষালনের ও মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করে। ... এই কাল্পনিক বস্তুগুলির যদি সত্যিকার কোনও গুণ থাকত তবে তা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকল জাতের লোকের উপরই সমভাবে ফলপ্রসূ হত, কোনও বিশেষ জাতের বিশ্বাস ও অভ্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত না। কারণ, যদিও ফলের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সামর্থ্যের তারতম্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা বলে কোনও বিশেষ মতাবলম্বীর উপর নির্ভর করে না। দেখতে পাও না কি, কেউ যদি মিষ্টি মনে করে বিষ খায় তবে বিষেরই ক্রিয়া হয়, আর তাতে প্রাণ যায়।'

এই বইতে রামমোহন লিখেছেন, 'ভারতের বর্তমান যুগের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক বস্তুতে বিশ্বাস এত বেড়েছে যে লোকে যখনই কোনও আশ্চর্য বস্তু দেখে তখনই সেটি তাদের পৌরাণিক যুগের বীরগণের কিংবা বর্তমানের সাধু সন্ন্যাসীদের উপর আরোপ করে এবং তার সুস্পষ্ট কারণ বর্তমান থাকলেও সেটা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তার কারণ তো যাদের সুস্থ মন, যারা ন্যায়ানুরাগী তাদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না। ইওরোপের লোকদের অনেক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, বাজিকরের হাতসাফও নৈপুণ্য প্রভৃতি এমন অনেক জিনিস আছে, যার কারণ দৃশ্যত যেন অজ্ঞাত এবং মানববোধ শক্তির বহির্ভূত বলেই মনে হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাজাত তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখা যায় তা হলেই এই আপাত গুহ্য কারণগুলি বেশ সন্তোষজনক ভাবেই জানা যায়। এই সন্ধান পেলে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় বিশ্বাসী (লোকের) দ্বারা বুদ্ধিমান লোকেরা আর প্রভাবিত হবেন না। তবে এ বিষয়ে আমরা বড় জোর এই বলতে পারি যে কোনও কোনও ব্যাপারে তীক্ষ্ণ গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও অনেক আশ্চর্য ঘটনার কারণটা লোকের অজ্ঞাত থেকেই যায়। সেসব ক্ষেত্রে আমাদের সুযুক্তির উপর নির্ভর করা উচিত এবং নিজেকে এই প্রশ্নই করা উচিত যে এর কারণটার জন্য আমাদের বুঝবার বর্তমান অক্ষমতাই দায়ী, না প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত অসম্ভব কোনও মাধ্যমের উপর আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত। আমি মনে করি যে আমাদের সুযুক্তি প্রথমোক্ত পন্থা বেছে নেবে। তা ছাড়া শত শত বছর আগে কোন মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে, বা কেউ স্বর্গারোহণ করেছে ইত্যাদি অসম্ভব ও অযৌক্তিক ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান করবার এমন কী দরকার পড়েছে?'

এই বইটিতে রামমোহন লিখেছেন, 'সাধারণ লোক প্রচলিত মতের দ্বারাই অভিভূত হয়। তাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে যখন তারা এমন কোনও কিছু দেখতে পায় যার রহস্য তাদের বুদ্ধির অগম্য অথবা যার কোনও কারণ দেখতে পায় না তখন তারা ইহা এক অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বলে বর্ণনা করে। এর রহস্য আসলে এই যে জগতের যাবতীয় বস্তুর বর্তমানতাই কোনও না কোনও আপাত কারণের এবং বিভিন্ন অবস্থার ও ন্যায় বিধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমরা যদি কোনও বস্তুর ভালো ও মন্দের মুখ্য ও গৌণ কারণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করে দেখি তবেই আমরা বলতে পারি যে ওই বস্তুর সত্ত্বার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু যখন অভিজ্ঞতার অভাবে এবং মতের সংকীর্ণতার জন্য কোনও কিছুর কারণ কারও কাছে অপ্রকাশিত থাকে তখন তার সুযোগ নিয়ে অন্য যে-কোনও মতলবী মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব ঘটনাকে নিজের অলৌকিক শক্তি বলে বর্ণনা করে তার দলেই লোককে আকর্ষণ করে।' এই বইতেই রামমোহন লিখেছেন, '...একটা উক্তির সত্যতা শুধু উক্তিটির পরিপোষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে না।... সত্যানুসন্ধিৎসুদের দ্বারা ইহা স্বীকৃত হয়েছে যে একমাত্র সত্যই সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে হলেও পালনীয়।'

ভক্তিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিচার বিশ্লেষণের মন গড়ে তোলার সংগ্রামের সাথে সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি অসম সাহসিকতায় লড়াই শুরু করেছিলেন। সতীদাহ প্রথা, নারী শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আজীবন লড়েছেন।

ভারতের জমিদারি ও রায়তোয়ারি ব্যবস্থায় কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে ১৮৩২ সালে রামমোহন লিখেছেন, 'দুই ব্যবস্থাতেই কৃষকদের পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক। একটিতে তাঁরা জমিদারের

সাতের পাতায় দেখুন

ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২২ মে হুগলি জেলার খানাকুলে এই মহান মনীষীর বসতবাড়ি থেকে তাঁর জন্মস্থান পর্যন্ত সুসজ্জিত পদযাত্রার আয়োজন করে রাজা রামমোহন রায় সার্ধদ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালন কমিটি। তাঁর মূর্তিতে গার্ড অফ অনার প্রদর্শন করে ছাত্র-ছাত্রীরা। পদযাত্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র-যুব মহিলা শিক্ষক স্বাস্থ্যকর্মী রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি সহ প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। পদযাত্রার সূচনা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং কমিটির সম্পাদক ডাঃ তুষারকান্তি পাকিরা। মিছিলের শেষে সকল পদযাত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক ডঃ পরেশচন্দ্র দাস। এরপর সেখানে একটি বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরে ৪ শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

এআইডিএসও-এআইডিওয়াইও-এআইএমএসএস-কমসোমল এবং পথিকৃৎ-এর উদ্যোগে রাজ্যের নানা স্থানে রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পদযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার ভারত সভা হলে পাঁচটি সংগঠন আয়োজিত সভায় আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। সভা পরিচালনা করেন এআইএমএসএস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্ত। সভায় প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

বাস্তবতার নামে বিকৃত বাস্তবের প্রদর্শন

চিনের মানবতাবাদী সাহিত্যিক লু সুন এর একটি সুন্দর কথা আছে—সব ফুলই রঙিন কিন্তু সব রঙিন জিনিসই ফুল নয়, তেমন সব সাহিত্যই প্রচার কিন্তু সব প্রচার সাহিত্য নয়। 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমাটা দেখতে বসে এই কথাটা যেন আবার স্পষ্ট হল।

কাশ্মীর ফাইলস দেখাতে বিজেপি এত ব্যগ্র কেন

বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবিটিকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিজেপি'র নেতা-মন্ত্রীরা প্রথম থেকেই ছবিটি নিয়ে বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। গুজরাত-হরিয়ানা-কর্ণাটক-মধ্যপ্রদেশ সহ বেশ কিছু রাজ্যে ছবিটি ট্যাক্স-ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্য সরকারি ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে, সিনেমা হল এর সমস্ত টিকিট কিনে নিয়ে, ফেসবুক-টুইটারে ঢালাও প্রশংসা করে মানুষকে উৎসাহিত করেছে কেন্দ্রের শাসক দল। এককথায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি তার যাবতীয় প্রচারযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ছবিটির পাবলিসিটির জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন, 'এমন সিনেমার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ প্রকৃত সত্য জানতে পারেন।'

কিন্তু কাশ্মীর ফাইলস সিনেমায় যা দেখানো হয়েছে তা কি যথার্থ ইতিহাস নাকি ইতিহাসের বিকৃতি? পরিচালক কি সত্যিই কোনও অজানা সত্য তুলে ধরেছেন? নব্বই এর দশকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা এবং তাদের উপত্যকা ছেড়ে চলে আসার সময়ের যথার্থ ছবি কি পরিচালক দেখিয়েছেন? সেই ঘটনার কোনও তথ্যনিষ্ঠ গবেষণার ছাপ আছে এই ছবিতে? সচেতন দর্শকের অভিজ্ঞতা বলছে, বাস্তবে এর কোনওটাই ঘটেনি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এ। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা তো দুরের কথা, একটা ভুল জিনিস বাজে জিনিসকেও গল্পের মোড়কে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপন করতে যেটুকু আড়াল-আবডাল দরকার তারও ধার ধারেননি পরিচালক। কাহিনী-চরিত্র-ঘটনাক্রম সর্বত্রই এত অসঙ্গতি এবং বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ধরা পড়েছে যে সাদা চোখেই ছবিটিকে অত্যন্ত মোটা দাগের অপপ্রচার বলে ধরতে অসুবিধা হয় না। এটা কি শুধুমাত্র পরিচালকের খেয়ালখুশি এবং দক্ষতার অভাবের প্রশ্ন? তা হলে ছবিটি নিয়ে এত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বাস্তব তা নয়।

শিল্পের কাজ অন্যায়ের স্বরূপ এবং যথার্থ কারণ চিনতে সাহায্য করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করা। 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' তার সম্পূর্ণ বিপরীতে ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ বিদ্বেষ তৈরি করতে চেয়েছে। বিবেক অগ্নিহোত্রী খুব স্পষ্ট কয়েকটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ছবিটি বানিয়েছেন। এক) নব্বই এর দশকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সাথে যে অন্যায় ঘটেছিল, তার একটা মিথ্যে ছবি তুলে ধরে 'মুসলিম মানেই সন্ত্রাসবাদী' এই ধারণাটিকে শক্তিশালী করা এবং ছবির পরতে পরতে উগ্র মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিজেপি-আরএসএস এর হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের অ্যাজেন্ডাকে শক্তিশালী করা। দুই) কাশ্মীরের জনগণের উপর বছরের পর বছর ধরে সরকারি দলগুলির বিশ্বাসঘাতকতা এবং সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দমন-পীড়নকে সম্পূর্ণ আড়াল করে কাশ্মীরের যাবতীয় সমস্যার জন্য সেখানকার সাধারণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের দায়ী করা। যাতে কাশ্মীরের বুকে ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং শ্বাসরোধকারী মিলিটারি শাসনকে সরকারের ন্যায়সঙ্গত বাধ্যতা বলে চালানো যায়। তিন) উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির যে কোনও বিরুদ্ধ স্বরকে, গণতান্ত্রিক চেতনাকে, বিশেষত বামপন্থাকে দেশের শত্রু হিসাবে তুলে ধরা। এককথায়, চলচ্চিত্রের মতো একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যমের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে সরকারের কাশ্মীর নীতির ব্যর্থতাকে আড়াল করা এবং সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পালে বাতাস দেওয়ার একটি পরিকল্পিত উদ্যোগ 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'।

কী আছে এই ছবিতে? কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারের একটি ছেলে, নাম কৃষ্ণ পণ্ডিত, তার ঠাকুরদার কাছে মানুষ হয়েছে এবং বর্তমানে 'এএনইউ' নামক একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছেলেটি যখন খুব ছোট, তার বাবা-মা-দাদা'কে সন্ত্রাসবাদীরা ১৯৯০-এর কাশ্মীরে নৃশংসভাবে হত্যা করে, কৃষ্ণ সে সব ঘটনার কিছুই জানে না। এক অধ্যাপিকা তাকে স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটে সভাপতি পদে দাঁড় করাচ্ছেন। পরিচালকের ভাষ্য অনুযায়ী এএনইউ হচ্ছে জেএনইউ, সুতরাং সেখানকার এই প্রভাবশালী অধ্যাপিকা অবধারিতভাবে মিথ্যাবাদী, কুচক্রী, তিনি সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেন, নিজের স্বার্থে তিনি এই ছেলেটিকে ক্রমাগত ভুল বোঝান। প্রয়াত ঠাকুরদার শেষকৃত্যের জন্য ছেলেটি কাশ্মীর যায় এবং সেখানে পাঁচজন বয়স্ক মানুষের সাথে তার দেখা হয়। এঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে কৃষ্ণ'র ঠাকুরদাকে চিনতেন এবং এই পণ্ডিত পরিবারের সাথে হওয়া ভয়াবহ হত্যালীলার কথা জানেন। এঁদের কথা শুনে, বিশেষত এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের কাছে কিছু পুরনো কাগজপত্র, সংবাদপত্রের রিপোর্ট দেখে কৃষ্ণ'র চোখ খুলে যায়। সে নিজের পরিবারের সাথে হওয়া অন্যায়ের কথা জানতে পারে এবং বুঝতে পারে যে ওই অধ্যাপিকা তাকে এতদিন ভুল বুঝিয়েছেন। কাশ্মীরের আসল সমস্যা হল সেখানকার মুসলিম জনগণ, এই মুসলিমরাই কাশ্মীরে বছরের পর বছর হিন্দুদের ওপর নারকীয় অত্যাচার করেছে পণ্ডিতদের বিতাড়ন করেছে ইত্যাদি। কাজেই, যারা কাশ্মীরের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলেন তারা সবাই সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক এবং দেশদ্রোহী। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই সে এএনইউ'তে ফিরে সে সমবেত ছাত্রদের সামনে ভাষণ দেয় এবং ওই অধ্যাপিকার মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। মোটামুটি এই হল ছবির কাহিনি।

ছবির বয়ানে অসঙ্গতি ও অযৌক্তিক ঘটনার সমাবেশ

প্রথমত, ছবির বয়ানে প্রচুর অসঙ্গতি এবং অযৌক্তিক ঘটনার সমাবেশ। কৃষ্ণ'র ঠাকুরদা পুষ্কর পণ্ডিত একজন শিক্ষক, নিজের ছেলে সহ সমগ্র পরিবারের নৃশংস মৃত্যুর সাক্ষী। ছবিতে তিনি একজন স্পষ্টবক্তা, পণ্ডিতদের জন্য সুবিচার চান, প্ল্যাকার্ড হাতে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার বিলোপ চেয়ে মিছিল করেন। অথচ তাঁর কাছেই বড় হওয়া নাতি কৃষ্ণকে তার যুবক বয়স পর্যন্ত তিনি কোনও দিন কিছুই বলেননি! কেন? ছবিতে তার কোনও উত্তর নেই। জেএনইউ'র মতো নামী প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়া একটি ছাত্রের কোনও নিজস্ব জানার জগৎ বা মতামত তৈরি হয়নি, তাকে অতি সহজেই যে কেউ যে কোনও কিছু বুঝিয়ে দলে টানতে পারে! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সেই প্রতিষ্ঠানের সমস্যা বা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোনও সমস্যা ইস্যু নয়, জেএনইউ'র নির্বাচনের একমাত্র বিষয় হচ্ছে কাশ্মীর সমস্যা! এমন হয় নাকি! ছবির বয়ান অনুযায়ী যে পাঁচজন কৃষ্ণ'কে সত্য জানাচ্ছেন বা বলা ভাল এতদিন লুকিয়ে রাখা সত্য ইতিহাস খুঁড়ে বের করে আনছেন, তাঁরা এতদিন কোথায় ছিলেন? নব্বই এর দশকে এই বিপন্ন পণ্ডিত ও তাঁর পরিবারের দুঃসময়ে তাঁরা পাশে দাঁড়ালেন না কেন? তারপরে দীর্ঘ তিরিশ বছর বা তাঁদের ভূমিকাই বা কী? এই 'সত্যি'গুলো জানা সত্ত্বেও তাঁরা এতদিন কৃষ্ণকে বলেননি কেন? এমন অজস্র কেন-কী করে-কীভাবে'র উত্তর ছবিতে অনুপস্থিত। অনুপস্থিত, কারণ এই কৃষ্ণ চরিত্রটাকে এরকম অজ্ঞ, অপরিণত না বানালে পরিচালকের ইচ্ছেমতো জেএনইউ'র অধ্যাপিকাকে দিয়ে তার মগজধোলাই করানো যাবে না। আবার পরিবারের সব কথা তার থেকে গোপন না রাখলে লুকিয়ে রাখা ফাইলের রোমাঞ্চ তৈরির মালমশলায় ঘাটতি পড়বে। অধ্যাপিকা চরিত্রটি আনার একমাত্র উদ্দেশ্য যেহেতু বামপন্থাকে কাঠগড়ায় তোলা, সুতরাং এই মহিলার মুখ দিয়ে বাস্তবতার বালাই না রেখেই একেবারে খলনায়ক মার্কা কিছু সংলাপ বলাতে হবে। আসলে, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দুঃখ-যন্ত্রণার যথার্থ ছবি তুলে ধরা, তিন দশক ধরে ক্ষমতাসীন সরকারগুলো পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারল না কেন সেই প্রশ্ন তোলা, এমনকি ছবিটির ঘটনা পরম্পরাকে বৌদ্ধিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কোনও দায় পরিচালকের ছিল না। এ ছবির প্রতিটি ফ্রেম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, পরিচালকের একমাত্র উদ্দেশ্য বিজেপি-আরএসএস ক্যাম্পের ভোটব্যাঙ্ক সংহত করা, তাতে ইতিহাসই বিকৃত হোক আর শিল্প চুলোয় যাক, কিছু এসে যায় না।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং দেশভাগের সময় কাশ্মীর ছিল ডোগরা রাজাদের অধীনস্থ একটি স্বশাসিত রাজ্য, শাসক ছিলেন রাজা হরি সিং। ইতিহাস বলে হরি সিং নন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে কাশ্মীরের সাধারণ জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধি দল ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং তার অবিসংবাদী নেতা শেখ আবদুল্লা'র ভূমিকা ছিল প্রধান। দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে এটা ছিল ঐতিহাসিক জবাব। ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিপরীতে ভারতীয় সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র' তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বাতন্ত্রের মর্যাদা দেবে এই স্বপ্ন নিয়েই শেখ আবদুল্লা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিলেন। ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরের স্বশাসন এবং বিশিষ্টতাকে মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারাটি যুক্ত হয়। যার বলে বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ—এই তিনটি বিষয় ছাড়া কাশ্মীরের যে কোনও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সেখানকার জনগণের নির্বাচিত সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ৩৭০ ধারার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কাশ্মীরের জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করা এবং তার মাধ্যমে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায়, শুধু আইনি চুক্তিতে নয়, মানসিকভাবেও কাশ্মীরের মানুষের সাথে বাকি ভারতের একাত্মতা গড়ে তোলার বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করা ছিল স্বাধীন ভারতের ক্ষমতাসীন সরকারের কর্তব্য। অথচ বাস্তবে ঘটে ঠিক এর উল্টো।

সংঘ পরিবার সহ বিভিন্ন বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং কংগ্রেস, বিজেপি সহ নানা দলের কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিত উদ্যোগে একের পর এক অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ বাস্তবে ৩৭০ ধারার মর্যাদা ক্রমশ লঘু করে দেয়। কেন্দ্রীয় শাসকদলগুলির আচরণে কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে ভারত সরকার সম্বন্ধে অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। তাকে ব্যবহার করে আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো তাদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে। ভারত সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতি, রাজ্যের চরম অনুন্নয়ন, কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ গড়ে না তোলা, মানুষের জীবন জীবিকার প্রতি সরকারের চরম অবহেলা, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র-বেকারি ইত্যাদির কারণে সরকারের উপর মানুষের চরম ক্ষোভ তৈরি হয়। কাশ্মীরের স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলি, যারা ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশ নিয়ে এমএলএ-এমপি হয়, তারা ক্ষমতার মধুভাণ্ডের ভাগ পেতে কেন্দ্রীয় শাকদলগুলির লেজুড়বৃত্তিই করতে থাকে। ফলে কাশ্মীরের জনগণের অসহায়তার সুযোগ নেয় সাম্রাজ্যবাদী নানা শক্তি ও পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি। সে ক্ষেত্রেও এই সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত করে জনগণের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচির উদ্যোগ, জনগণের পূর্ণ সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে কাশ্মীরের মানুষের ভরসা বিশ্বাস অর্জন করার বদলে ভারত সরকার তার মিলিটারির বন্দুকের জোরে কাশ্মীরকে শাসন করতে চায়। বছরের পর বছর কাশ্মীরের জনসাধারণ তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত, তাঁদের কথা শুনবে এমন কোনও সিভিল প্রশাসনকে পায়নি। সামরিক তাকতই সেখানে একমাত্র প্রশাসন। ফলে নির্বচার গ্রেপ্তার, সন্দেহ হলেই গুলি, রাস্তায় বেরোলেই নানা হেনস্থা, কারফিউ, ফোন- ইন্টারনেট বন্ধ, যখন তখন বাড়িতে তল্লাশি, জঙ্গিদের ধরার নামে নিরীহ সাধারণ মানুষের বাড়িতে সামরিক বাহিনীর তাণ্ডব— এগুলোই যেন কাশ্মীরের স্বাভাবিক জীবন। বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার অসংখ্য পুরুষ

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাস্তবতার নামে বিকৃত বাস্তবের প্রদর্শন

পাঁচের পাতার পর

নিখোঁজ, মহিলারা ধর্ষিতা, বিনা অপরাধে জেলবন্দী হয়ে সেনার পাশবিক অত্যাচারে মারা গেছেন অজস্র সাধারণ মানুষ। ২০১৯-এ বিজেপি শাসনে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে কাশ্মীরের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ কেড়ে নেওয়ার পদক্ষেপ কাশ্মীর উপত্যকায় নির্বিচারে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর পথ আরও প্রশস্ত করে। গদি মিডিয়ার খবরে বা বলিউডের মূলধারার উগ্র জাতীয়তাবাদে কাশ্মীরের মানুষের সাথে হওয়া বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গের এই দীর্ঘ ইতিহাস জানা যাবে না। যদি ধরে নিই, বিজেপি ঘনিষ্ঠ পরিচালক কাশ্মীরের অতীত ইতিহাসের মধ্যে ঢুকতে চাননি, তার নিজস্ব এজেন্ডা অনুযায়ী শুধু পণ্ডিতদের ঘরছাড়ার ঘটনাটিকেই ফোকাস করেছেন, সেখানেও কি তিনি সত্য এবং তথ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছেন? নাকি পণ্ডিত বিতাড়নের জন্য যে কোনও ভাবে মুসলিম ধর্ম এবং সেই ধর্মের মানুষকে দায়ী করতে হবে বলে মনগড়া গল্প সাজিয়েছেন?

বিতাড়িত পণ্ডিতদের সংখ্যা মোট পণ্ডিত সংখ্যার চেয়ে বেশি?

দেখা যাক, যে ছবি সত্য ইতিহাস তুলে এনে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সুবিচার দেবে বলে বিজেপি'র নেতা-মন্ত্রীরা দাবি করছেন, সেই কাশ্মীর ফাইলস ইতিহাসের প্রতি কতটা সুবিচার করেছে। ছবিতে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘটনাকে বারবার 'জেনোসাইড' বা 'গণহত্যা' বলা হয়েছে। পরিচালক দেখাচ্ছেন, ওই সংঘর্ষের সময় থেকে ৪০০০ কাশ্মীরি পণ্ডিত খুন হয়েছেন এবং পাঁচ লক্ষ পণ্ডিত কাশ্মীর উপত্যকা উৎখাত হয়ে চলে গেছেন। অথচ সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী খুন হওয়া পণ্ডিতের সংখ্যা ২১৯। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংগঠন কেপিএস-এর একটি সমীক্ষা বলছে এই সংখ্যা ৩৯৯ থেকে ৬৫০ এর মধ্যে (সুত্রঃ স্ক্রোল.ইন, মার্চ ২০২২)। নানা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ও সেন্সাস রিপোর্ট অনযায়ী ১৯৯০-এ কাশ্মীরে পণ্ডিতের সংখ্যা সংখ্যাটা ১ লক্ষ, ৬০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার-এর মধ্যে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ইভান্সের মতে, ১৯৯০ সালে ৯৫ শতাংশ কাশ্মীরি পণ্ডিত উপত্যকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অর্থাৎ ১ লক্ষ, ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার জন"(সুত্রঃ কাশ্মীর-ইতিহাসের পাতায় রক্তের দাগ, এপিডিআর)। অন্যান্য গবেষকদের মতে এই সংখ্যা আরও কম। জম্মু-কাশ্মীরের সরকারি ওয়েবসাইট বলছে ওই সময় ৬০ হাজার কাশ্মীরি হিন্দু পরিবার উপত্যকা ছেড়ে চলে যান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য যাই থাক, কোনও তথ্যই কাশ্মীর ফাইলস এর মনগড়া সংখ্যাকে সমর্থন করছে না।

এ তো গেল পরিসংখ্যানের কথা। বিবেক অগ্নিহোত্রীর বর্ণনায় ধর্মীয় তকমাই মানুষের একমাত্র পরিচয়। তাই পণ্ডিতরা সন্ত্রাসবাদের স্বীকার কাশ্মীরের অসংখ্য সাধারণ মানুষের অংশ নন, তাদের মূল পরিচয় তারা হিন্দু। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ওপর হত্যালীলা চালানো সন্ত্রাসবাদীদের এটাই পরিচয়— তারা মুসলমান। ছবিতে কোথাও একটিও মানবিক মুসলমান চরিত্র নেই। সিনেমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলিম মানেই বর্বর, মিথ্যেবাদী, ধর্ষকাম, নিষ্ঠুর। পণ্ডিতদের মেরেছিল যারা তারা সন্ত্রাসবাদী, এটা পরিচালকের কাছে গৌণ, আসল উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলিমকেই সন্ত্রাসবাদী প্রমাণ করা। এটা করার ক্ষেত্রে তিনি এতটাই বেপরোয়া, যে কাশ্মীরের মুসলমান শিশুদেরও তিনি রেয়াত করেননি। তার 'সত্যানুসন্ধানী' চিত্রনাট্যে মুসলমান পরিবারের শিশুরা পণ্ডিত তাড়ানোর স্লোগান দেয় আর পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে, মুসলিম স্কুলশিক্ষক ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক হিংসা শেখায়। কয়েকজন মুসলমান একটি হিন্দু পরিবারের বাচ্চাকে জোর করে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলায়। পুষ্কর পণ্ডিতের 'ওম নমঃ শিবায়' এর উত্তরে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ছবির মূল ভিলেন সন্ত্রাসবাদী বিট্টা বলে 'কাশ্মীরে থাকতে হলে আল্লাহ আকবর বলতে হবে'। এভাবেই প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে, সংলাপে, ঘটনায় পরিচালক ব্যক্তিমানুষের ধর্মপরিচয়কেই প্রধান করে দেখিয়েছেন। এমনকি পণ্ডিতদের প্রতিবেশী মুসলিমরাও প্রত্যেকেই ধূর্ত, শঠ, প্রতারক, চরিত্রহীন। এক মুসলমান প্রতিবেশী একটি পণ্ডিত পরিবারকে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে বলছেন এবং তারপরেই সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তারা কোথায় আশ্রয় নিয়েছে সেটা ফাঁস করে দিচ্ছেন। আর একজন মুসলমান, পরিচিত পণ্ডিত মহিলাকে সুরক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে কুপ্রস্তাব দিচ্ছেন। অর্থাৎ কোনও রাখঢাক না করেই বিবেক অগ্নিহোত্রী তার মুসলিমবিদ্বেষ এর অ্যাজেন্ডা চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। আর একটি আশ্চর্যের বিষয়, যে দেশ এবং রাজ্যের বুকে পণ্ডিতরা এ ভাবে অত্যাচারিত হলেন, তাদের সুবিচার চাইতে বসে পরিচালক একটিবারের জন্যও তৎকালীন সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন মনে করলেন না! পণ্ডিতদের চলে যাওয়া আটকানো বা তাদের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের ভূমিকা কী ছিল? সন্ত্রাসবাদীরা কি শুধু বেছে বেছে হিন্দু পণ্ডিতদের খুন করেছিল, নাকি অন্য ধর্মের মানুষও সেই তালিকায় ছিলেন? কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমান নাগরিকরা কি পণ্ডিতদের ওপর এই আক্রমণ সমর্থন করেছিলেন? সচেতন দর্শকের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্নগুলো উঠবে।

রাজ্যপাল জগমোহনের পণ্ডিত বিতাড়নী ভূমিকা

১৯৮৯-এর ডিসেম্বর থেকে বিজেপি সমর্থিত জনতা দল ছিল কেন্দ্রের ক্ষমতায়, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভি পি সিং। বিজেপি তখন লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে রথযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, যা ভারতবর্ষের মাটিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আরেকটি কলঙ্কিত অধ্যায়। এই সময় কুখ্যাত মুসলিমবিদ্বেষী জগমোহনকে দ্বিতীয় বারের জন্য কাশ্মীরের রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়। এই জগমোহন আগে কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৮৪ থেকে '৮৭ পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়িয়েছেন। কংগ্রেস সবসময়েই কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক উত্তজনাকে জিইয়ে রাখাতে চেয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিনিধি জে এম শাহ ১৯৮৩-'৮৪ সালে জম্মুতে মন্দিরের মধ্যে মসজিদ তৈরির মতো উস্কানিমূলক কর্মসূচি নিয়ে দাঙ্গায় উৎসাহ দেন। ১৯৮৭-তে কংগ্রেস নিজেদের মনমতো সরকার বসানোর জন্য কাশ্মীরের নির্বাচনে খোলামেলা রিগিং করার জন্য যুবকদের হাতে অত্যাধুনিক রাইফেল পর্যন্ত তুলে দেয়। এদিকে দিল্লির পুতুল সরকার জনগণ মেনে নিতে পারেনি। তার সুযোগ নেয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কংগ্রেসের দেওয়া অস্ত্রই তখন তাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য এই কংগ্রেস সর্বভারতীয় স্তরে এবং জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে বারবার আরএসএসের সমর্থন লাভ করেছে।

দ্বিতীয়বার রাজ্যপাল হয়ে এসে প্রথম দিন থেকেই জগমোহন কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের ওপর সংগঠিত রাষ্ট্রীয় মদতে সন্ত্রাস নামিয়ে আনেন। নিরাপত্তা বাহিনী নামিয়ে মুসলিমদের বাড়ি খানাতল্লাশি, মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার, বহু যুবককে বিনা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা কোনওটাই বাদ যায়নি। এর প্রতিবাদে এবং জনজীবনের নানা দাবি নিয়ে মানুষ পথে নামলে মিলিটারি সেই নিরস্ত্র মানুষগুলোর ওপর গুলি চালিয়ে ৫২ জনকে হত্যা করে (মানবাধিকার সংগঠনগুলির মতে ৩০০ জন) এবং ২৫০ জন মারাত্মকভাবে আহত হন। ১৯৯০ এর ২১ জানুয়ারির এই ঘটনা গাওকদল হত্যাকাণ্ড নামে কুখ্যাত। এই মিছিলের সাথে যে গণতান্ত্রিক দাবিগুলি ছিল তাকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার পারত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে। তার মধ্য দিয়ে জনগণের থেকে সন্ত্রাসবাদী-বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আলাদা করা যেত। কিন্তু দমনের পথে গিয়ে সরকার বিচ্ছন্নতাবাদীদের হাতই শক্ত করল। পণ্ডিতরা যখন সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন, তখন মুসলিম এবং পণ্ডিত নাগরিকদের পক্ষ থেকে যুগ্মভাবে জগমোহনের কাছে পণ্ডিতদের সুরক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। কিন্তু তিনি এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও তার শরিক বিজেপি বেশি আগ্রহী ছিল পণ্ডিতদের উপত্যকা ছাড়ার ঘটনাকে প্রচার দিয়ে কাশ্মীরে সামরিক তাকত বাড়ানোয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সুমিত গাঙ্গুলি বলেছেন— জগমোহন ঘোষণা করেন, 'যদি কেউ উপত্যকায় থেকে যেতে চায়, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের নয়।' কাশ্মীরের পরিস্থিতি বিচার না করে, সেখানকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা না বলে, একটি মুসলিম প্রধান অঞ্চলে একজন মুসলমানবিদ্বেষী প্রশাসক পাঠিয়ে এবং সাধারণ মানুষের ওপর একতরফা দমনপীড়ন কায়েম করে কেন্দ্রের সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক তাস খেলেছিল। দু'জন প্রথিতযশা বিচারপতি রাজিন্দর সাচার এবং ভি এম তারকুন্ডে এবং দু'জন শিক্ষাবিদ বলরাজ পুরি ও অমৃত সিং কাশ্মীর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ১৯৯০ এর মার্চ-এপ্রিল মাসে কাশ্মীরে যান। তদন্তের শেষে তাঁরা বলেন যে, পণ্ডিত বিতাড়নের দায় সরকার এবং জঙ্গিগোষ্ঠী উভয়ের উপরেই বর্তায়। এসব কোনও কিছুই আলোচ্য কাশ্মীর ফাইলসে নেই, কারণ সরকারের ওই ন্যক্কারজনক ভূমিকা সামনে এলে সেটা স্পষ্টতই বিজেপি-আরএসএস-এর বিপক্ষে যাবে। একই ভাবে পরিচালক এ সত্যও সম্পূর্ণ আড়াল করে গেছেন যে, শুধু হিন্দু পণ্ডিতরাই নন, বহু মুসলমান নাগরিকও ওই সময় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে খুন হন। বাস্তবে, নিহত মুসলিমদের সংখ্যা ছিল পণ্ডিতদের চেয়ে বেশি। সন্ত্রাসবাদীরা স্বভাবতই এক্ষেত্রে কোনও ধর্মবিচার করত না। সেইসময়ের সংবাদপত্র, বিভিন্ন রিপোর্ট, মন্তব্য এমনকি জঙ্গিগোষ্ঠীর স্বীকারোক্তিতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 'একটি বিষয় হল, ১৯৯০ থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতরাই খুনের একমাত্র লক্ষ্য নন। নানা জঙ্গি গ্রুপের আদর্শ থেকে যে কাশ্মীরি মুসলমানরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন, পণ্ডিতদের মতো তাঁদেরও ধারাবাহিক ভাবে খুন হতে হয়েছে (লেখিকা মৃদু রাই-এর সাক্ষাতকার)।' ১৯৯০ এর ২১ মে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ধর্মীয় নেতা মীরওয়াইজ মৌলভি ফারুক সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন। প্রশাসক হিসেবে এই হত্যাকে নিন্দা করা বা শোকার্ত মানুষকে সংহতি জানানো তো দুরের কথা, জগমোহনের নির্দেশে পুলিশ তাঁর শবযাত্রায় গুলি চালিয়ে ৪৭ জন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। এহেন জগমোহনকে কেন ২০১৬ তে বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার পদ্মভূষণ দিয়েছিল আর কাশ্মীর ফাইলসের 'সাহসী' পরিচালক কেন তাঁকে সম্পূর্ণ আড়াল করে গেছেন, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সন্ত্রাসবাদীরা যেমন নীলকান্ত গঞ্জু, টিকালাল টাপলু, লাসা কউল'কে মেরেছে, তেমনই তারা হত্যা করেছে মহম্মদ শাহবান উকিল, মৌলানা মসুদী, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মশিরুল সাহেব এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিব অব্দুল গণিকে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা মহম্মদ ইউসুফ হাওয়াইকে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের মতোই কাশ্মীরের মুসলমান নাগরিকরা সেদিন নিজেদের বিপন্ন অবস্থার মধ্যেও সীমিত শক্তিতে পণ্ডিতদের চলে যাওয়া আটকাতে চেয়েছেন এবং আজও কাশ্মীরের মুসলমান নাগরিকরা পণ্ডিতদের এই চলে যাওয়াকে ঘিরে গভীর মনোকষ্টে ভোগেন। প্রাক্তন আইবি অফিসার এবং 'র'(রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং) এর অধিকর্তা এএস দৌলত সেইসময় কাশ্মীরে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একটি সাম্প্রতিক মন্তব্যে এই সৌহার্দ্যের উল্লেখ করে বলেছেন, পণ্ডিতদের নিশ্চয়ই নিশানা করা হয়েছে, কিন্তু আরও বেশি সংখ্যায় আক্রান্ত হয়েছেন মুসলিমরা। যে পণ্ডিতরা থেকে গেছিলেন, মুসলিমরা তাঁদের সুরক্ষা দিয়েছেন সাহায্য করেছেন।

'পণ্ডিত মুসলিম ভাই ভাই' ভারতীয় ফৌজ কাঁহাসে আয়ি

মজার ব্যাপার হল আজ পর্যন্ত কোনও সরকারই পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। তথ্যের অধিকার আইনের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, কাশ্মীরে জঙ্গি অভ্যুত্থানের সময় থেকে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ১৭২৪ জন খুন হয়েছেন, যার মধ্যে ৮৯ জন কাশ্মীরি পণ্ডিত (সুত্র মাউন্টেন ইঙ্ক, মার্চ ২০২২)। সাগরিকা কিসসুর একটি লেখায় কিছু কাশ্মীরি পণ্ডিতের বয়ান পাওয়া যায়। পুলওয়ামার কাছে তাহাব গ্রামের বাসিন্দা কাশ্মীরি পণ্ডিত এবং মুসলমানরা আজও দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়ে একসাথে আছেন। এমনই একজন পণ্ডিত অজয় রায়না বলছেন, 'প্রত্যেক বছর আমি আমার স্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের সাথে দেখা করতে কাশ্মীর আসি।

সাতের পাতায় দেখুন

বাস্তবতার নামে বিকৃত বাস্তবের প্রদর্শন

ছয়ের পাতার পর

আমরা কোনও দিন কোনও হুমকির সম্মুখীন হইনি। আমি প্রায় সব দেশ ঘুরেছি এবং আমি এখনও এটাই বলব যে কাশ্মীর হচ্ছে স্বর্গ। ... হ্যাঁ এটা ঠিক যে কিছু যুবক জঙ্গি গোষ্ঠীতে যোগ দিচ্ছে, কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে মিথ্যে কুৎসা রটানোর ক্ষেত্রে মিডিয়া একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছে।' (সুত্রঃ নিউজ ক্লিক, জুন ২০২২)। প্রদীপ ম্যাগাজিন তাঁর 'নট জাস্ট ক্রিকেট' বইতে নিজের অভিজ্ঞতা এবং বন্ধু বিবেক রায়নার মুখে শোনা তৎকালীন কাশ্মীরের কথা লিখেছেন। বিবেকের পরিবারও সেইসময় কাশ্মীর ছেড়ে চলে আসেন। সেই বইতে প্রদীপ লিখছেন, 'আমি যতবার কাশ্মীরে গেছি, কাশ্মীরি পণ্ডিত হিসাবে সেখানে ঢুকতে বা মুসলমান নাগরিকদের সাথে মেলামেশা করতে আমার কোনও দিন অসুবিধা হয়নি।' এই বইতে বিবেক রায়নার স্মৃতি উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন, যখন অশান্তি শুরু হল, দু-এক জন পণ্ডিত এবং মুসলিম জঙ্গিদের হাতে খুন হলেন, তখনও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে পণ্ডিতদের আশ্বস্ত করে স্লোগান দিয়েছেন — 'পণ্ডিত মুসলিম ভাই ভাই, ভারতিয় ফউজ কাঁহা সে আয়ি'(পণ্ডিত মুসলিমরা পরস্পরের ভাই, এর মধ্যে ভারতীয় ফৌজ কোথা থেকে এল)। জনগণের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এই ভারতীয় ফৌজ কাশ্মীরের জনগণকে কি দৃষ্টিতে দেখত এবং কেমন সুরক্ষা দিত, তার জ্বলন্ত প্রমাণ বিবেকের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় গাওকদল হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা — 'একদিন, ওদের তিনতলা বাড়ির বারান্দা থেকে বিবেক দেখল, হাজারখানেক লোক শ্রীনগরের গাওকদল ব্রিজের উপর মিছিল করছে। হঠাৎ তারা ভয়ে দৌড়াতে শুরু করল। জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সিআরপিএফ গুলি চালাতে শুরু করল, অন্তত আঠাশ জন মারা গেল (যদিও এই সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে, কারও কারও মতে নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩০০)। একটু পরে, বিবেকের কাকা, যিনি বাড়ির একতলায় থাকতেন তিনি দুধ কিনতে বেরোন এবং একজন সিআরপিএফ জওয়ান তাঁকে আটকায়। তিনি যখন বললেন, তিনি একজন কাশ্মীরি পণ্ডিত, তখন জওয়ানটি তাঁকে মেরে বলল— 'কাশ্মীর কা কুত্তা ভি পাকিস্তানি হ্যায় (কাশ্মীরের কুকুরও পাকিস্তানি)।' পণ্ডিতদের খুনের দৃশ্য যথাসম্ভব বিস্তারিত এবং পাশবিকভাবে দেখানোর জন্য বিবেক অগ্নিহোত্রী সাল-তারিখ নিয়েও তেমন মাথা ঘামাননি। যেমন, ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকারের আমলে হওয়া নাদিমার্গ হত্যাকাণ্ডকে তিনি অনায়াসে ৯০ এর দশকে জুড়ে দিয়েছেন। স্বভাবতই হরিদ্বার বা রায়পুরের ধর্মসংসদ থেকে মুসলিমদের গণহত্যার ডাক ওঠায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতের যে প্রধানমন্ত্রী আপত্তি করেননি, তিনি এই ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে 'শিকারা' ছবি সরকারি আনুকুল্য পায়নি

'কাশ্মীর ফাইলস' কে ট্যাক্স ফ্রি করার প্রসঙ্গে গুজরাট দাঙ্গার ওপর নির্মিত দুটি ছবির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন অনেকেই। সেন্সর বোর্ডের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও রাহুল ঢোলাকিয়ার 'পারজানিয়া' (২০০৫) এবং নন্দিতা দাসের 'ফিরাক' (২০০৮) এই দুটি ছবিই গুজরাটে নিষিদ্ধ করা হয়, সিনেমা হলের মালিকরা ছবি দেখাতে অস্বীকার করে। এমনকি হাল আমলে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়েই নির্মিত আরেকটি ছবি 'শিকারা'ও সরকারের এমন স্নেহধন্য হয়নি, কারণ পরিচালক সেখানে তাঁর মতো করে একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তে পণ্ডিতদের ঘটনার নানা দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান বৈরিতা তৈরি করে ঘৃণা ছড়াতে বসেননি। খুব সম্প্রতি এই ঘরছাড়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়েই 'ঘর কা পতা' নামে একটি শর্ট ফিল্ম মুক্তি পেয়েছে। পরিচালক মধুলিকা জালালি কাশ্মীরি পণ্ডিতকন্যা। নব্বই এর অশান্ত কাশ্মীর থেকে যখন মধুলিকা'র পরিবার চলে আসে, তিনি তখন খুব ছোট। কাশ্মীর তার কাছে ধরা দেয় মা-বাবা-দিদি'র স্মৃতিচারণে, টুকরো লেখালিখি, চিঠিপত্র, পুরনো পারিবারিক অ্যালবামে। এমন সব টুকরো স্মৃতি জড়ো করে কাশ্মীরে আসেন মধুলিকা ও তার বোনেরা, দেখা হয় ফেলে আসা পথঘাট, শহর আর সেই শহরের ফেলে আসা মানুষদের সঙ্গে। মধুলিকার বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে বৃদ্ধ মুসলমান প্রতিবেশী কেঁদে ফেলেন, তাঁর স্ত্রী বুকে জড়িয়ে ধরেন দুই বোনকে। পণ্ডিত-মুসলিম শত্রুতার চেনা ছকের বাইরে এই ছবি ভালোবাসা আর সম্প্রীতির কথা বলতে চেয়েছে। কাজেই 'কাশ্মীর ফাইলস' এর পৃষ্ঠপোষকদের পছন্দের তালিকায় এ ছবি জায়গা পায়নি। কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিচালক সঞ্জয় কাক ছবিটির প্রশংসা করে বলেছেন, 'আজকের ভারতে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে স্রেফ এক ধাঁচের আখ্যানই প্রাণপণে প্রচার করা হচ্ছে। সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের কথা বলার জন্য মূল ধারার ছবি 'শিকারা'ও দক্ষিণপন্থীদের চক্ষুশূল। এখন 'কাশ্মীর ফাইলস' দিয়ে সার্বিক ভাবে কাশ্মীরি মুসলিমদের নিশানা করা হচ্ছে।' মধুলিকার নিজের বক্তব্য, "কাশ্মীরের সত্যির মধ্যে অনেক পরত। কোনও সরকারই পণ্ডিতদের সুবিচার দিতে কিচ্ছু করেনি। ৩৭০ ধারা রদ করার পরেও পরিস্থিতি পাল্টায়নি।"

কাশ্মীর ফাইলস এর উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা বা সমালোচনা যারা করেছেন, 'গণতান্ত্রিক' বিজেপি সরকার একেবারে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই তাদের জবাব দিয়েছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিংহ টুইট করে বলেছেন, সরকারের উচিত আইন প্রণয়ন করে কাশ্মীর ফাইল ছবিটি দেখা বাধ্যতামূলক করা। যারা ছবিটি দেখবেন না, তাদের জেল হওয়া উচিত এবং ছবিটির সমালোচনা করার শাস্তি হওয়া উচিত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মধ্যপ্রদেশের আইএএস অফিসার নিয়াজ খান বলেছিলেন, 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবিতে ব্রাহ্মণদের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখানো হয়েছে। তাঁদের সসম্মানে এবং নিরাপদে কাশ্মীরে থাকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে বিরাট সংখ্যক মুসলিম খুন হচ্ছেন, তা নিয়েও প্রযোজকের সিনেমা বানানো উচিত। মুসলিমরা পোকামাকড় নন, তাঁরাও মানুষ এবং এই দেশের নাগরিক।' এ কথা বলার জন্য নিয়াজ খান'কে শো-কজ নোটিশ ধরিয়েছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অন্য দিকে রাজস্থানের আলোয়াড়ে এক দলিত যুবক প্রশ্ন করেছিলেন, 'কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর অত্যাচার দেখানো হয়েছে বলে ছবিটি করমুক্ত করা হয়েছে। অত্যাচার তো দলিত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপরেও হয়। তাহলে 'জয় ভীম' (দলিত নিপীড়নের উপর নির্মিত একটি সাম্প্রতিক ছবি) এর মতো ছবিকে করমুক্ত করা হয় না কেন?'

কাশ্মীর ফাইলস বিভেদ তৈরির হাতিয়ার

কিছু মানুষ হয়ত প্রকৃত ইতিহাস না জেনে ভুল বুঝেছেন, আবার সিনেমার নামে শিল্পের নামে একটি সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে এই ঘৃণার বেসাতি সচেতন মানুষ মেনে নেননি। তাঁরা প্রশ্ন করেছেন, কলম ধরেছেন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য যারা সত্যিই সুবিচার চান, তাঁদের বুঝতে হবে এই পণ্ডিত বিতাড়ন কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। স্বাধীনতার সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত সরকারি নীতি এবং তার পরিণতিতে শান্তিপূর্ণ উপত্যকার বুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর উত্থানের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সহ কাশ্মীরের হাজার হাজার নাগরিকদের মতোই পণ্ডিতরাও পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। সেদিনও যেমন ক্ষমতাসীন সরকার নিজের স্বার্থে এই ঘটনাকে হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের চেহারা দিতে চেয়েছিল, আজও বুর্জোয়া শ্রেণির আশীর্বাদধন্য হয়ে তাদের তাঁবেদার যে দলই ক্ষমতায় বসুক, তারা পণ্ডিতদের পুনর্বাসন বা কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত সমাধান চাইবে না। সমস্যা বিভেদ জিইয়ে রেখে সামরিক দমনপীড়ন আরও বাড়াবে, অন্য দিকে নিজেদের ভোটবাক্স ভরাতে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনে উস্কানি দেবে। আজ গুজরাটে ভয়ানক ধর্মীয় বৈষম্যের স্বীকার ৬০০ মুসলমান মৎস্যজীবী আদালতের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আর্জি জানিয়েছেন। আবার ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় পাকিস্তান থেকে আসা ৮০০ হিন্দু পরিবার ভারত সরকারের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতা না পেয়ে নিঃস্ব হয়ে পাকিস্তানে ফিরে গেছেন।

হিন্দু-মুসলমান-শিখ-পণ্ডিত যাই হোক না কেন, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক দলগুলোর কাছে সাধারণ মানুষের চোখের জলের কোনও মূল্য নেই। আর্থিক শোষণে নিষ্পেষিত মানুষ যখন ক্ষোভে ফেটে পড়ে, মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় তখন জাতপাত ধর্মের জিগির তুলে সাধারণ মানুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে শাসক সেই ক্ষোভ চাপা দিতে চায়। মানুষ গড়ে ওঠার পথেই বাধা সৃষ্টি করতে চায়। বিজেপি সরকারের অচ্ছে দিনে'র কল্যাণে নাভিশ্বাস ওঠা ভারতবাসীর সামনে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'ও এমনই একটি বিভেদ তৈরির হাতিয়ার।

কৃষক সম্মেলন

তিনের পাতার পর

তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমস্যার মৌলিক সমস্যা সমাধান তাদের ভাবনার এবং ক্ষমতার অতীত।

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এ আই কে কে এম এস তার যাত্রার শুরুতেই এ দেশে পুঁজিপতি শ্রেণি তথা তাদের প্রবর্তিত শোষণমূলক ব্যবস্থাকে শত্রু চিহ্নিত করেছে। রাজ্যে তে-ভাগা আন্দোলন, ভাগচাষিদের অধিকার রক্ষা, বেনাম জমি উদ্ধার ও বণ্টন, খরা বন্যার স্থায়ী সমাধান, ফসলের ন্যায্য দাম, সার-বীজের কালোবাজারি বন্ধ, সারাবছরের কাজ, ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি দাবিতে লাগাতার আন্দোলন পরিচালনায় এ আই কে কে এম এস পালন করছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রাজ্যে কৃষক মজুর আন্দোলনে এ আই কে কে এম এস এক পরিচিত নাম— এক বিশ্বস্ত শক্তি। আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতায় দিল্লি আন্দোলনের অপূরিত দাবি—সকল কৃষিপণ্যে এম এস পি আইন সঙ্গত করা, সস্তায় কৃষি উপকরণ, গ্রামীণ বেকারদের সারা বছরের কাজ ও ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি দাবিতে রাজ্যব্যাপী কৃষক খেত মজুর আন্দোলনে দুর্বার গতি সৃষ্টি করতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২৫০ জন্মবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

চারের পাতার পর

লোভ লালসার শিকার। অন্যটিতে তাঁদের বহন করতে হয় জরিপকারী ও রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের শোষণ ও চক্রান্তের বোঝা। দুক্ষেত্রেই আমার গভীর সহানুভূতি তাঁদের প্রতি— পার্থক্য শুধু এই যে, বাংলার কৃষকদের ক্ষেত্রে জমিদারেরা তাঁদের রাজস্ব সাব্যস্তের সময় সরকারের তরফ থেকে দাক্ষিণ্য ভোগ করে থাকেন কিন্তু সে দাক্ষিণ্যের এক অংশও প্রসারিত হয় না গরিব কৃষকদের বেলায়। ভালো ফসলের দিনে যখন ফসলের দাম পড়ে যায় তখন তাঁদের পুরো ফসলটাই বেচতে হয় জমিদারের খাই মেটাতে-- - বীজধান বা মেহনতি মানুষ বা তাদের পরিবারের পোষণের জন্য প্রায় কিছুই থাকে না।'

আধুনিক চিন্তাচর্চা করলেও লড়াইয়ের পথে ধর্মবিশ্বাসকে পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি রামমোহন। রামমোহনই প্রথম যিনি লড়েছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য। বিকশিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা গদ্যকে। মান্ধাতা আমলের সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ভারতের তরুণ প্রজন্মকে তিনি শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষায়, যে শিক্ষা বিনা বিচারে মেনে নিতে শেখাবে না বরং প্রশ্ন করতে শেখাবে, বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ বর্জন করতে শেখাবে।

এই সব কারণে ধর্মীয় মৌলবাদীদের কাছে রামমোহন আজও সাক্ষাৎ এক আতঙ্ক। আরএসএস-বিজেপি'র নেতারা আজও তাঁকে গালিগালাজ করে চলেছেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার নির্মাণে রামমোহনের অবদান সংগ্রামী মানুষ কোনও ভাবে ভুলবে না। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন সংগ্রাম থেকে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমান যুগের সমাজ সংস্কার বা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই উত্তরাধিকারীর কর্তব্য।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

উপাসনাস্থল রক্ষা আইন মানতে হবে

একের পাতার পর

প্রতিফলন। এই আইন তৈরির উদ্দেশ্যও ছিল তাই। তা হলে সেই দায়িত্বের কথা আজ সরকার কিংবা কোর্ট ভুলে যায় কী করে? তবে কি আইনের শাসন একটি কথার কথা মাত্র? না হলে, কী করে সুপ্রিম কোর্ট বলে, ধর্মস্থান সংক্রান্ত আইন অনুসারে কোনও ধর্মস্থানের চরিত্র নির্ণয়ে কোনও রকম বাধা নেই। চরিত্র নির্ণয়ের অনুমতি দেওয়া কি পরিস্থিতিকে আর জটিল করে তোলার সুযোগ করে দেওয়া নয়? উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে যে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ অযোধ্যায় রামমন্দিরের পক্ষে রায় দিয়েছিল, বর্তমান বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি চন্দ্রচূড় তার সদস্য ছিলেন।

বাস্তবে একের পর এক মসজিদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের দাবি তোলার মধ্য দিয়ে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের উপর যে আক্রমণ নামিয়ে আনছে বিজেপি-আরএসএস, তাতে একটা আইনি আড়াল দেওয়ার জন্যই এ ভাবে আইন ব্যবস্থাকেও এর সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে ভাবে সমীক্ষার রিপোর্ট তৈরি হওয়ার আগেই শিবলিঙ্গ থাকার কথা প্রচার হয়ে গেল, সমীক্ষার রিপোর্ট কোর্টে জমা পড়ার আগেই যে ভাবে তা ফাঁস হয়ে গেল, কোর্ট রায় দেওয়ার আগেই যে ভাবে মসজিদের একাংশ সিল করে দেওয়া হল, সবটার মধ্যেই একটা পূর্ব পরিকল্পনার ইঙ্গিত স্পষ্ট হচ্ছে না কি? বিচার ব্যবস্থাও কি প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে না?

সংবিধানের ঘোষণা অনুযায়ী ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সব পদক্ষেপ সংবিধান মেনে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়েছিল, এমন কোনও প্রমাণ কোনও সমীক্ষাতে প্রকাশিত হয়নি। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে, সেই যুগটা ছিল রাজতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্রের যুগ। রাজা-সম্রাট-সুলতানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরস্পরের রাজ্য দখল, মৃত্যু-ধ্বংস লেগেই থাকত। এটাই ছিল সামন্ততন্ত্রের স্বাভাবিক চরিত্র। মুসলমান ধর্মাবলম্বী সুলতান-বাদশাহরা যেমন তা করেছে, হিন্দু রাজার-সম্রাটরাও তেমনই তা করেছে। সে যুগ বিগত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি-আদর্শ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি-আদর্শের থেকে গুণগত ভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। সেদিনের সত্যের বিচার আজকের সত্য দিয়ে হয় না। সেদিনের কোনও সত্য আজ আর 'প্রকৃত সত্য' বা সেদিনের কোনও ঘটনা আজ 'ঐতিহাসিক ত্রুটি' হিসাবে পরিচিত হতে পারে না। শত শত বছর ধরে এ দেশে বারবার বিদেশি আক্রমণ হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে রাজা সম্রাটরা পরস্পর যুদ্ধ করেছেন। কলিঙ্গ যুদ্ধে সম্রাট অশোকের নেতৃত্বে কলিঙ্গ বাহিনীর এক লক্ষ সৈন্য মারা যায় বলে ইতিহাসে কথিত আছে। মারাঠা বর্গিরা এক সময় বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। নাদির শাহ দিল্লিকে ধ্বংস করে কোহিনূর সহ হাজার বছরের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল। দুশো বছর ধরে ব্রিটেন ভারতকে শাসন করেছে, শোষণ করেছে, লুঠ করেছে। ভারতীয়দের উপর নির্মম অত্যাচার করেছে, বিপ্লবীদের ধরে ধরে ফাঁসি দিয়েছে। এ-সবই সত্য। সেই সত্যের জোরে আজ যেমন অমিত শাহরা নাদির শাহের ইরান আক্রমণ করতে যাবেন না তেমনই সেদিনের আক্রমণকারীদের দেশগুলি বা ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। কিংবা দেশের অজস্র বৌদ্ধ মঠকে ভেঙে পরবর্তী সময়ে মন্দির তৈরি হয়েছে। সেই সব মন্দির ভেঙে পুনরায় বৌদ্ধ মঠ তৈরির দাবিকেও মানা যায় না। কিছুদিন আগেও এমন দাবি কেউ করলে তার মানসিক সুস্থতা নিয়েই প্রশ্ন উঠত। আর আজ বিজেপি শাসনে তাদেরই 'দেশপ্রেমিক' বলে প্রচার করা হচ্ছে। তবে ভবিষ্যতে যখন আজকের ইতিহাস লেখা হবে তখন এদেরই ভণ্ড, স্বৈরাচারী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, গণতন্ত্রহত্যাকারী বলে পরিচয় লেখা থাকবে।

স্বাভাবিক ভাবেই আজ 'ইতিহাসের ত্রুটি' সংশোধনের কোনও দাবি কোনও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গ্রাহ্য হতে পারে না। বাস্তবে এমন দাবি কোনও সচেতন মানুষ তুলছেন না। এমনকি কোনও হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষেরও এটা দাবি নয়। এই দাবিকে পরিকল্পিত ভাবে ধুরন্ধর বিজেপি-আরএসএস নেতারা পিছনে থেকে উস্কানি দিয়ে তোলাচ্ছেন ভোটের লক্ষ্যে মেরুকরণ ঘটাতে। আর তারা এটা পারছেন কারণ, সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই দেশের মানুষের মধ্যে যে বিভেদের বীজ থেকে গিয়েছিল তা উপড়ে ফেলার জন্য সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার যে প্রসার ঘটানোর দরকার ছিল সে কাজটা হয়নি। তার জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি যে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালনের প্রয়োজন ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন তা অবহেলা করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও কেন্দ্রে শাসক কংগ্রেস এবং রাজ্যে রাজ্যে যারা ক্ষমতায় বসেছে তারাও একই রকম ভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে অবহেলা করেছে। ফলে ধর্ম সম্পর্কে আধুনিক ধারণা, যা ধর্মকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবেই দেখে এবং রাষ্ট্র সব ধর্ম থেকেই নিজেকে দূরে রাখে, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সব ধরনের কাজই পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক চিন্তা এবং রীতিনীতির ভিত্তিতে—এই বিষয়টিকে অবহেলা করে, কার্যত ধর্ম কেন্দ্রিক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং তাকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করে ভোটের স্বার্থে কাজে লাগানো হয়েছে। আজ বিজেপি-আরএসএস সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, ধর্মস্থান দখল এগুলি কোনওটিই ধর্মবোধ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া নয়। বরং সুপরিকল্পিত একটা ক্রিয়ার পরম্পরা যা বিপজ্জনক। দাঙ্গার পরিকল্পিত প্রবাহ।

দেশের মানুষকে আজ একটা কথা গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে, দেশের অর্থনীতি আজ বিধ্বস্ত। তার সমস্ত বোঝা এসে পড়েছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের উপর। সাধারণ মানুষ দিন-রাত পরিশ্রম করে পরিবার প্রতিপালনের খরচটুকুও তুলতে পারছে না। প্রতিদিন বিরাট অংশের মানুষ দারিদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। বিপরীতে সমাজের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা সমাজের ৯৯ শতাংশ মানুষের পরিশ্রমের ফসলকে আত্মসাৎ করে তাদের সম্পদের পাহাড়কে ক্রমাগত উঁচু করে চলেছে। এই শোষণ-বঞ্চনা আর বৈষম্যকে আড়াল করতেই শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস, তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা শাসক দলগুলি যে যখন ক্ষমতায় থাকে, যেমন এখন বিজেপি রয়েছে ক্ষমতায়, তারা এমন করে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধায়, ধর্মে ধর্মে বিরোধ বাধায়, মানুষের নজরকে ঘুরিয়ে দিতে শোষিত মানুষের মধ্যে দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্র করে এবং এভাবে পুঁজিবাদের শোষণকে আড়াল করে।

এই হিন্দুত্ববাদীরা, বিজেপি-আরএসএস বাহিনী যদি পাঁচশো বছর আগেকার মন্দির উদ্ধার করতে এত আগ্রহী, তবে আধুনিক যুগের যে 'মন্দিরগুলি' ৯৯ শতাংশ মানুষের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে, সেই রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা, খনি, বন্দর, সড়ক, রেল, তেল, ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি সব জাতীয় সম্পদ-সম্পত্তি যে আজ বিজেপি সরকার লোপাট করে দিচ্ছে, ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে, দেশের জনগণের শত্রু একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে, সেই সব সম্পদ-সম্পত্তি রক্ষা করতে, সেগুলি উদ্ধার করতে তাদের কোনও আগ্রহ দেখা যায় না কেন? একচেটিয়া পুঁজির পক্ষে সরকারের এই নগ্ন দালালির বিরুদ্ধে একটি কথাও তারা উচ্চারণ করে না কেন? এর থেকেই স্পষ্ট, মন্দির-মসজিদ বিতর্কটাই আসলে মেকি, বানানো। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু ধর্মের ধ্বজাধারী এই সব নেতাদের পরিকল্পিত।

ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতার গদির দখল নেওয়া, অন্য দিকে সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করার এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষকে এই দুষ্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সোচ্চার হতে হবে। দাবি তুলতে হবে, মন্দির হোক, মসজিদ হোক, গির্জা হোক প্রতিটি ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল রক্ষা আইনকেই কার্যকর করতে হবে। এই আইন বদলের চেষ্টা চলবে না।

মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজ্য জুড়ে রাস্তায় নামলেন মহিলারা

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রতিদিন ঘটে চলেছে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ। দুধের শিশু থেকে বৃদ্ধা কারও যেন রেহাই নেই বিকৃতকাম লম্পটদের হাত থেকে। দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর সাথে যুক্ত আছে মদ্যপরা। অথচ রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ করা দূরে থাক দুয়ারেই মদ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে মদ নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন (এ আই এম এস এস)। মদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, দুয়ারে মদ প্রকল্প বন্ধ করা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সংগঠন ডাক দিয়েছিল ১৯ মে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিক্ষোভের। এই কর্মসূচিতে প্রতিটি জেলায় শত শত মহিলা সামিল হন।

কলকাতায় সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্তের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে লালবাজারের কাছে আবগারি দফতর পর্যন্ত যায়। সেখানে দুয়ারে মদ প্রকল্পের সার্কুলারে আগুন দেন কমরেড কল্পনা দত্ত।

পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুকে রাস্তা অবরোধে মহিলারা। ১৯ মে

পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ব্লকের বেলদাতে বিক্ষোভ ও অবরোধ হয়। মিছিল কেশিয়াড়ী থানা এলাকা থেকে শুরু হয়ে ট্র্যাফিক স্ট্যান্ডের সামনে এসে দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ অবরোধ। দুয়ারে মদ প্রকল্পের সার্কুলার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রতিলিপিতে আগুন দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রীতা প্রধান।

শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে মিছিল প্রধান ডাকঘরের সামনে পৌঁছালে সেখানে মহিলারা পথ অবরোধ করেন। এরপর কোর্ট মোড়ে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক শিখা নন্দী, সভনেত্রী সুপ্রীতি পাল, সংগঠনের নেত্রী ঝর্ণা দাশগুপ্ত প্রমুখের নেতৃত্বে সার্কুলারের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

তমলুক, জলপাইগুড়ি, বহরমপুর, পুরুলিয়া সহ সমস্ত জেলা সদরেই কর্মসূচিটি পালিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com